

## করোনা প্রতিরোধ নয়, ভোটই লক্ষ্য বিজেপির

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, অত্যন্ত দুঃখের কথা, কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভোটের দামামা বাজাতে বর্তমান এমন একটা সময়কে বেছে নিলেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনায় আক্রান্ত, হাজার হাজার মানুষ মৃত। শুধু তাই নয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে এবং সরকার জনগণকে কার্যত এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের করুণার ওপর ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে আতঙ্কিত বিমূঢ় জনগণ ভেবে পাচ্ছে না কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে।

লক্ষণীয়, ভারতবর্ষে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা করোনা বিধ্বস্ত পশ্চিমী দেশগুলোকে প্রায় অতিক্রম করতে বসেছে। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও ইতিমধ্যে সতর্কতা জারি করে বলেছে ভারতবর্ষে অতি দ্রুত করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় বিশ্বের ষষ্ঠে স্থানে পাবে। উল্লেখযোগ্য যে, কোটি কোটি ছাঁটাই শ্রমিক, পরিযায়ী মজুর এবং বেকার যুবক চরম দারিদ্র ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং অনেকেই সরকারি ন্যূনতম সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে মারা যাচ্ছে। শাসকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কি প্রমাণ করে না যে দেশের মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে শাসকদের কোনও মাথাব্যথা নেই? তাদের একমাত্র লক্ষ্য দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে এমনকি করোনা ও ক্ষুধায় মৃত দেশবাসীর শরীরের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে মন্ত্রিসভার গদি দখল করা।

## বাস মালিকদের চাপে

## জনস্বার্থকে উপেক্ষা করছে সরকার

বাস মালিকরা কি সরকারের থেকেও শক্তিশালী? অন্তত পশ্চিমবঙ্গে বাস নিয়ে যে টালবাহানা চলছে তা দেখে এ কথাই মনে হয়। সরকার বেসরকারি বাস মালিকদের কাছে প্রায় কাকুতি মিনতি করছে অথচ আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাস অধিগ্রহণ করে তা চালাতে বাধ্য করতে পারছে না। ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে

করতে বলেছিল বাস মালিকদেরই। এই রকম ব্ল্যাক চেক হাতে পেয়ে মগকা বুঝে বিপুল লাভের রাস্তা খোলার জন্য বাস মালিকরা যে অঙ্কের ভাড়া নির্ধারণ করেছিল তাতে মানুষের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। এস ইউ সি আই (সি) তখনই এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

আনলক-ওয়ান পর্ব। ধাপে ধাপে অফিস, দোকান বাজার সমস্ত খুলে গেছে। কলকাতা সহ জেলায় জেলায় মানুষ করোনা মহামারির সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় তুলে রেখে বাধ্য হচ্ছেন বাড়ুঝেবালা হয়ে বাসে যাতায়াত করতে। এর ফলে যে মারাত্মক হারে করোনা মহামারি বেড়ে যেতে পারে তা সকলেই বলছেন। সরকার কদিন আগেই রাস্তায় চকের গণ্ডি কেটে কেটে পরস্পরের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা প্রচার করছিল। এখন দমবন্ধ ভিড়ে কী করে দূরত্ব রক্ষা হবে সেই প্রেসক্রিপশনটা যদি তারা দিত তবে মানুষের বড় উপকার হত।



এস ইউ সি আই (সি) নেতা কর্মীদের উপর তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে ৩ জুন সহস্রাধিক মানুষ মিছিল করে বকুলতলা থানায় বিক্ষোভ দেখান। সংবাদ দুইয়ের পাতায়

সরকার প্রথমে বলেছিল বাসে কুড়ি জন করে যাত্রী তোলা যাবে। ভাড়া ঠিক

## কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সাপের কামড়ে মৃত্যু

### শ্রমিকদের প্রতি

### সরকারি অবহেলার নজির

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

গতকাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যুর ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির নির্লজ্জ অবহেলার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। অন্য একটি সেন্টারে এক শ্রমিক বলেছেন, করোনায় যদি মরতেই হয় মরব, বন্ধ ঘরে সাপের কামড়ে মরব কেন। শ্রমিকদের প্রতি সরকারি উদাসীন্যের এর চেয়ে নগ্ন উদাহরণ আর কী হতে পারে!

অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ ব্যাপক হারে বাড়তে থাকার এই সময়ে বাসে যতগুলি আসন, ততজনই যাত্রী উঠবেন— সরকারের এই ঘোষণা সত্ত্বেও বাসের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বাসগুলিতে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনতেই আসন সংখ্যার সমান যাত্রী নিলে শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করার কথা প্রহসনে পরিণত হয়, তার উপর এই প্রবল ভিড়ের ফলে সংক্রমণের মাত্রা উর্ধ্বগামী হচ্ছে। এই অবস্থায় সরকারের কাছে আমরা দাবি করছি, প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়ে অধিক সংখ্যক বাস-মিনিবাস-ট্রাম চালানো হোক।

## দেশ পোড়ানোর কারিগর বিজেপি গড়বে 'সোনার বাংলা'?

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। সেই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন তিনি। একের বার্তা দিতে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই বাংলা। সেই বাংলাকে ভাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ধ্বংস করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবল স্রোত ব্যর্থ করে দিয়েছিল ব্রিটিশের এই চক্রান্ত।

বাংলার দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে এই 'সোনার বাংলা'-কে ভাগ করার জন্য বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এই বাংলারই এক সন্তান। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শগত গুরু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীনদয়াল উপাধ্যায়, গুরু গোলওয়ালকর প্রমুখ আরএসএস তাত্ত্বিকরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে মনে করতেন না। তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তঝরা গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে

ব্রিটিশের সহযোগিতাই করে গেছেন। সেই কারণে, এই বাংলায় আরএসএসের ঠাঁই হয়নি, বিজেপি বহু চেষ্টা করেও জায়গা করতে পারেনি। বাংলার মনীষা তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করেনি।

সেই বাংলাকে 'সোনার বাংলা' করার খোঁয়াব দেখাচ্ছেন বর্তমান বিজেপি নেতৃত্ব। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে প্রকাশ্য জনসভা এখন বন্ধ। এই প্রেক্ষাপটে ৯ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা অমিত শাহ তাঁর অনলাইন তথা ভার্চুয়াল দলীয় সভায় বঙ্গবাসীর কাছে আহ্বান জানানেন, "আপনারা কমিউনিস্ট, তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছিলেন। এবার একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন। মোদিজির নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়বে বিজেপি" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০-৬-'২০)।

এমন সময়ে তথা দুঃসময়ে অমিত শাহ বঙ্গবাসীর কাছে ভোটের আহ্বান জানানেন যখন ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণে মানুষের জীবন ভয়ঙ্কর ভাবে বিপর্যস্ত। অন্য দিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় সাতের পাতায় দেখুন

# জনস্বার্থকে উপেক্ষা করছে সরকার

একের পাতার পর

বলে, সরকার দরকার হলে ভরতুকি দিয়ে, না হলে বাস অধিগ্রহণ করে জনস্বার্থে বাস চালাক। এরপর গণবিক্ষোভের আশঙ্কায় ভাড়া বাড়তে না পেয়ে বাস মালিকদের চাপে সরকার বলে দিল যত সিট তত যাত্রী। এতে কী করে শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকবে, সরকার আর সে প্রসঙ্গ তোলেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন, সিটে কাগজ পেতে বসুন। তাতেই নাকি দূরত্ব বিধি মানা হয়ে যাবে! কিন্তু এত কিছু করেও মন পাওয়া যায়নি বাস মালিকদের। তাঁরা জেদ ধরে বসে আছেন ভাড়া বাড়তেই হবে, না হলে নাকি তাঁদের ক্ষতি হবে। সরকার আবার তাদের কিছু না বলে কিছু এসি, নন-এসি লাঞ্চারি বাসকে বাড়তি ভাড়া নিয়ে সরকারি তত্ত্বাবধানেই চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু বাস মালিকরা উদ্ধতভাবে বলেই চলেছেন ব্যাপক হারে ভাড়া না বাড়িয়ে তাঁরা বাস চালাবেন না। করোনা মহামারিতে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে কার্যত ব্ল্যাকমেইল করছে বাস মালিকরা। জনগণের আন্দোলন দেখলে যে সরকার তা ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারাই মালিকদের এই ব্ল্যাকমেইলের বিরুদ্ধে যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

কর্মক্ষেত্রে যেতে মানুষকে বেরোতেই হচ্ছে, তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। ঘটনার পর ঘটনা অপেক্ষা করে যদি বা একটা বাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে বসার সিট দূরে থাক তিলধারণের স্থান নেই। কিন্তু সত্যিই কি ভাড়াতে পোষাতে না পেয়েই মালিকরা বাস চালাতে পারছেন না? প্রথমত, আজকের এই মহামারির পরিস্থিতি সমাজের বড় অংশের মানুষের জীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এরকম নয় যে একা বাসমালিকরাই এই তিনমাস কোনও রোজগার করতে পারেননি। ফুটপাথের হকার, গৃহপরিচারিকা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, ছোট দোকানদার, বেসরকারি অফিসের নিম্নস্তরের কর্মচারী ইত্যাদি কারও পেটের ভাত জোগাড়ের সংস্থান নেই। তাই লকডাউন শিথিল হতেই তাঁরা কাজে ফিরতে মরিয়া। সেখানে সুযোগ পেয়েও বাস মালিকরা গাড়ি বসিয়ে রাখার বিলাসিতা দেখাচ্ছেন, অর্থাৎ এমন পেটের দায় তাঁদের যে নেই, তা পরিষ্কার। তার উপর বর্তমান বাস ভাড়ার হার সরকার নির্ধারণ করেছিল বাস পিছু সিট সংখ্যার ভিত্তিতেই। বাস মালিকদেরই দেওয়া হিসাব অনুসারে তাতেই তাদের লাভ থাকার কথা। কিন্তু লকডাউনের আগে পর্যন্ত বাস কি সারাদিন শুধু সিটে বসা যাত্রী নিয়ে চলেছে? দাঁড়ানো যাত্রীদের থেকে কি ভাড়া নেওয়া হয়নি? তেলের দাম তখন যা ছিল তারপর বেশ কয়েকবার তা কমেছে।

এখনও সেই সময়ের থেকে তেলের দাম কমই আছে। এ কথা ঠিক বিশ্ববাজারে তেলের দাম একেবারে তলানিতে পৌঁছে গেলেও তেল কোম্পানির ধনকুবের মালিক ও সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের আমিরির রসদ জোগাড়ের স্বার্থে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভারতে তেলের দাম খুব বেশি কমতে দেয়নি। কিন্তু রাজ্য সরকারও এ নিয়ে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করেনি। কারণ তারাও তেলের উপর থেকে বিপুল রাজস্ব তোলে। কিন্তু সেই ভার করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত জনগণের ঘাড়ে চাপানো হবে কেন? এখন মানুষের হাতে টাকা দেওয়ার বদলে সরকার নিজেই বাড়তি ভাড়া বাস চালিয়ে কর্মহীন, অন্নহীন মানুষেরই পকেট কাটার পথে হাঁটছে। আর যে বাস মালিকরা সিট অনুসারে যাত্রীর বদলে ঠাসা ভিড় নিয়েই বাস চালাচ্ছেন তারা রোগ ছড়াতে সাহায্য করে যে মারাত্মক অপরাধ করছেন, তার শাস্তি হবে না কেন?

গণপরিবহণকে কোনও সভ্য দেশের সরকার মুনাফার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। দেখলে সে দেশকে আর যাই হোক না কেন, জনকল্যাণকামী এমনকি যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বলা চলে না। জনজীবনের জন্য পরিবহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা। মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচার ন্যূনতম সুযোগ করে দিতে হলেও বিনামূল্যে অথবা সস্তায় যথাসম্ভব আরামদায়ক পরিবহণ আজ আবশ্যিক শর্ত। দেখা দরকার কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগেই শ্রমিকের প্রাণশক্তি ট্রেন-বাসের দমবন্ধ ভিড়ই যেন শুয়ে না নেয়। আজ করোনা মহামারির পরিস্থিতিতে তা আরও বেশি দরকার। কলকাতা এবং শহরতলির বাস পরিষেবা বিগত পনেরো দিনে যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তাতে অতি দ্রুত কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের করোনায় সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সরকার বাস মালিকদের কাছে নতি স্বীকার করে গোটা রাজ্যের মানুষকে বিপদে ঠেলে দিচ্ছে। এখন ২০ জনের বেশি বাসে তোলা এমনভেই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু তাই বলে মালিকদের মুনাফা পুষিয়ে দেওয়ার দায় তো রোজগার হারানো আধপেটা খেয়ে দিন চালানো মানুষের ঘাড়ে চাপানো চলে না! প্রয়োজনে সরকার তেলের রাজস্ব, রোড ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে বাসের খরচে ভর্তুকি দিক। কেন্দ্রীয় সরকারেরও এ বিষয়ে দায় আছে। তারা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তেলের রাজস্ব থেকে তোলে, ফলে তারাও গণপরিবহণে পুরো ভরতুকির ব্যবস্থা করুক। জনসাধারণের থেকেই এই দাবি আজ উঠছে।

প্রয়োজনে আন্দোলন করেই এই দাবি আদায় করতে হবে।

## জীবনাবসান

উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর এলাকায় এসইউসিআই (সি)-র প্রবীণ কর্মী কমরেড রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (সবার প্রিয় লাহিড়ীদা) ১৬ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদে ব্যারাকপুরের শিউলি পঞ্চায়ত এলাকার বহু মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। পাড়ার বহু মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কমরেড রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ছুটে যান কমরেড অমল সেন ও কমরেড শান্তিরাম দাস। তাঁর মরদেহে মালা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এসইউসিআই(সি) ব্যারাকপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে কমরেড স্বপন দেব ও কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন কমরেড অমল সেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত।



রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৯৩৫ সালের ৩০ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার এক উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনের বেশ কিছুটা অংশ কাটে উত্তর ভারতে। ১৯৫৮ সালে তিনি পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফে সরকারি চাকরি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। '৬০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন ও দমদম লোকাল কমিটির অধীনে কাজ শুরু করেন।

পারিবারিক সূত্রেই কমরেড রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবী ধারার পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর জ্যাঠামশাই ছিলেন বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হিন্দুস্থানি রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা বীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীও স্বাধীনতা সংগ্রামের এই আপসহীন বিপ্লবী ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে এই বিপ্লবী ধারার যথার্থ উত্তরসাধক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন কমরেড রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী। তিনি এই আদর্শের প্রচারে ব্রতী হন। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে, পার্টির বইপত্র, গণদর্শী পত্রিকা, গণসংগঠনের পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে তিনি নিরলসভাবে প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। দীর্ঘ বছর যাবৎ অফিসে যাতায়াতের পথে ট্রেনে, স্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে একা একাই প্রচার করতেন। বইপত্র এবং দলের বক্তব্য সম্বলিত পত্রিকা বিক্রি করতেন। দলের সংগ্রামী তহবিলে চাঁদা তুলতেন। তাঁর পরিবারে অনেক সমস্যা ছিল। স্ত্রী ও পুত্রের মানসিক ভারসাম্য ছিল না। ফলে সংসারের কাজ, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, অফিস করা— এসবের পরেও হাসিমুখে দলের কাজ করেছেন। কাউকে অসুবিধার কথা বলতেনও না। একদিন দলের এক কর্মসূচিতে দেরি করে আসেন। তার জন্য নেতৃত্বের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিছুক্ষণ পর সেই নেতার খেয়াল হয় লাহিড়ীবাবুর স্ত্রী খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলেন— 'হ্যাঁ আজই অপারেশন করাতে হল। সেখান থেকেই আসছি।' মিতভাষী আত্মপ্রচারে বিমুখ লাহিড়ীদা নীরবে কাজ করে যেতেন। গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদবোধ থেকেই তাদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। নানা কল্যাণমূলক কাজে এবং পাড়ার রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজে তিনি সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। সময় পেলেই নানা ধরনের বইপত্র পড়তেন। কোনও নিন্দা, অপপ্রচার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতকে হাসিমুখে জয় করতেন। এইসব বিরল গুণাবলির সাথে তাঁর ছিল দলের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। সহযোগী কমরেডদের প্রতি, বিশেষ করে জুনিয়র কর্মীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। তিনি এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। হাই সুগার, হৃদরোগ এবং শ্বাসকষ্ট সহ দীর্ঘদিনের রোগযন্ত্রণা তিনি নীরবেই সহ্য করেছেন। অসুস্থ হবার পরেও ফোন করে জানাতেন পেনশন তুলেছি, পার্টির চাঁদা ও অন্যান্য বকেয়াগুলো নিয়ে যাও। বাকি রেখো না। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন কর্মীকে।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী লাল সেলাম

## এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের উপর তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে জয়নগরে বিক্ষোভ

২৬ এপ্রিল ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি-দলবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানাতে এস ইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আনসার সেখ সহ ৪ জনের প্রতিনিধিদল যখন বিডিও দপ্তরে যান, সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়নগর-২ ব্লক সভাপতি একদল দুষ্কৃতিকে নিয়ে তাঁদের উপর হঠাৎ চড়াও হয়ে হামলা ও মারধর চালায়। ওইদিন বকুলতলা থানায় এফআইআর করার পরও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এর প্রতিবাদে ৩ জুন সহস্রাধিক মানুষ মিছিল করে বকুলতলা থানায় বিক্ষোভ দেখায় ও অপরাধীদের

অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। পুরো কর্মসূচিই পালিত হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে।

বিধ্বংসী আমফান ঝড়ে সহায়-সম্বলহীন সর্বস্বান্ত মানুষের জন্য সরকার-ঘোষিত ত্রাণ নিয়ে তৃণমূলের ব্যাপক দলবাজি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে একাধিকবার এসইউসিআই(সি) প্রতিবাদ করেছে। থানার পক্ষ থেকে এ দিন দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এদিন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য থেকে একজনও যাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে বিডিও-র কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

# করোনা অতিমারি হয়ে ওঠার জন্য সরকারি অবহেলাই দায়ী

করোনা অতিমারি মোকাবিলায় চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা জানতে গণদর্শীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল সার্ভিস ডস্ট্রস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর মতামত এখানে প্রকাশ করা হল :

করোনা সংক্রমণে দেখতে দেখতে ভারত বিশ্বের বেশির ভাগ দেশকে পিছনে ফেলে উঠে এসেছে চতুর্থ স্থানে। সর্বোচ্চ স্থান দখল এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর তালি বাজাও, থালা বাজাও-এর আহ্বানও পারল না করোনা আক্রমণের হাত থেকে আমজনতাকে রক্ষা করতে।

অত্যন্ত অপ্রতুল সংখ্যক করোনা পরীক্ষা এবং তথ্য গোপনের সব রকম সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখন প্রতিদিন দশ হাজারের উপরে মানুষ দেশে করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ রাজ্যেও সংখ্যাটি চারশোর উপরে। মৃত্যুর হারও নেহাত কম নয়। দেশে গড়ে চার শতাংশের কাছাকাছি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা পাঁচ শতাংশের উপরে। মৃত্যুর হার আর পাঁচটা রোগের তুলনায় কমই। কিন্তু ভয়ের বিষয় হল, রোগটি যেহেতু অতিরিক্ত মাত্রায় সংক্রামক, ফলে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে ঠিকমতো প্রয়োগ না করলে রোগটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর ফলে এক সাথে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই ব্যবস্থা না করতে পারলে মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে। সেই কারণেই রোগটি নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রোগটি নতুন হলেও, অর্থাৎ এর ভাইরাসটি পৃথিবীতে নতুন রূপে এলেও যেহেতু রোগটি প্রতিরোধযোগ্য এবং এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি আমাদের জানা, তাই আমরা আশা করেছিলাম, ভারতের মতো একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সরকার এই অতিমারি দমনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ কী দেখতে পেল ?

করোনা নিয়ন্ত্রণে লকডাউন একমাত্র পদক্ষেপ না হলেও তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর দ্বারা করোনা নির্মূল হওয়া যায় না, কিন্তু এর মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিছু দিনের জন্য। যে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রোগ নির্মূলকরণের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ দ্রুত রোগ নির্ণয় করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে টেস্টের ব্যবস্থা করা, চিহ্নিত এবং সন্দেহজনক মানুষদের সরকারি ভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা এবং কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ করা যায়। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এমনিতেই অত্যন্ত অপ্রতুল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী যেখানে প্রতি হাজার মানুষ পিছু কমপক্ষে ৩টি হাসপাতাল শয্যা থাকার কথা, সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ০.৭টি। অর্থাৎ এমনিতেই দেশে প্রয়োজন আরও প্রায় পাঁচগুণ বেশি হাসপাতাল শয্যা। করোনাজনিত কারণে এই প্রয়োজন স্বভাবতই আরও বহু গুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ দেশে আজ পর্যন্ত করোনার জন্য নতুন কোনও হাসপাতাল তৈরি করা হয়নি। ঠিক তেমনি বর্তমানে সরকারি পরিষেবা ডাক্তারের সংখ্যাও খুবই কম। বর্তমানে রয়েছে ১১০৮২ জন মানুষ পিছু মাত্র একজন ডাক্তার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী করোনা পূর্ববর্তী সময়েই এই প্রয়োজনটা ছিল এর পঁচিশ গুণ বেশি। করোনা পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজন আরও বহুগুণ বেড়েছে। একই ভাবে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘাটতিও মারাত্মক।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই এই পদক্ষেপকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কী কী করল ? আজ যখন আমরা জগতে আবার শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে চলেছি বলে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের দাবি, তার প্রাক্কালে একজন সূনাগরিক হিসেবে আপনি কি একবার ভেবে দেখবেন না, যে করোনা প্রতিরোধে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কী করা যেত এবং সরকার কী করে চলেছে ?

এ কথা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, কেন্দ্র এবং রাজ্য

উভয় সরকারই এ ব্যাপারে একের পর এক অবৈজ্ঞানিক ও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। এর ফলে সারা দেশব্যাপী করোনা আজ অতিমাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যে এই রোগে প্রাণ হারিয়েছেন। অন্য দেশের তুলনায় এ দেশে অনেক পরে করোনার প্রবেশ ঘটা সত্ত্বেও সংক্রমণের নিরিখে ভারত আজ ইতিমধ্যেই বিশ্বে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। এ-ও লক্ষণীয় যে, ইতিমধ্যেই আমেরিকা, ইতালি, স্পেনের মত তথাকথিত উন্নত দেশগুলি যখন করোনা যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েছে সেখানে জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং সঠিকভাবে লকডাউনকে কাজে লাগিয়ে কিউবা, ভিয়েতনামের মতো কয়েকটি দেশ করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা এবং সরকারি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা লক্ষ করলাম, আমাদের দেশ জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে কাজে না লাগিয়ে এবং লকডাউন সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপগুলি না নেওয়ায় আজ দেশের জনগণ এই ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার হচ্ছে এবং দেশবাসী আরও ভয়ঙ্করতম দিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি— ক) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দেরি, খ) ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংবর্ধনা সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত করা, গ) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতের অনুমতি দেওয়া, ঘ) বিদেশ থেকে আসা ১৬ লক্ষ মানুষের কোয়ারেন্টাইন বা করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা না করা, ঙ) পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রথমেই ঘরে ফিরিয়ে না আনা এবং ফেরানো নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের দড়ি টানাটানি। ফিরে আসার পরে তাদের উপযুক্ত পরীক্ষা ও সরকারি কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা না করা, চ) প্রথম থেকেই দরিদ্র দিনমজুর, সাধারণ মানুষের কাছে রেশনের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে না দেওয়া এবং রেশন নিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতি, ছ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা করার নাম করে মদের দোকান খুলে দেওয়া।

লকডাউন চালু করা, শিথিল করা বা বন্ধ করা কোনও ক্ষেত্রেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ভাইরোলজিস্ট, এপিডেমোলজিস্টদের নিয়ে গঠিত কোনও বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত নেওয়া হয়নি। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যখন দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, তখন মদের দোকান, শপিং মল, ধর্মীয় স্থানের মতো অধিক জমায়েতের জায়গাগুলি খুলে দেওয়া হল। কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য, মানুষ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গণপরিবহণের ব্যবস্থা করা হল না।

এই সব কিছুর পরিণাম হল মারাত্মক। লকডাউনের জন্য দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশায় পড়লেও, কোটিকোটি মানুষ ইতিমধ্যে কর্মচ্যুত হলেও এবং দেশের অর্থনীতি ভেঙে তছনছ হয়ে গেলেও করোনা নিয়ন্ত্রণে তার কার্যকারিতা প্রায় কিছুই দেখা গেল না। উপরন্তু আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সরকার চতুর্থ দফা লকডাউন শেষে করোনা নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দায়িত্ব থেকেই হাত ওঠিয়ে নিয়ে এবং সমস্ত দায় মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে দেশের মানুষকে আরও ঘোরতর বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার সরকারি এই পদক্ষেপের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং লকডাউন শিথিল করা বা তুলে নেওয়ার আগে সরকার যাতে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ নেয় সেই দাবি করছি।

## বিদ্যুৎ বিল-২০২০

### গ্রাহকদের উপর চাপবে আরও বর্ধিত দামের বোঝা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর উপর সংশোধনী এনে যে জনবিরোধী বিল সম্প্রতি উত্থাপন করেছে, তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন, দেশ জুড়ে করোনা অতিমারির দ্রুত সংক্রমণ এবং দু'মাসেরও বেশি দীর্ঘ লকডাউনের ফলে সৃষ্ট এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেট মালিকদের মুনাফার স্বার্থে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি বিল নিয়ে এসেছে। সাধারণ গ্রাহকদের উপর যা চাপিয়ে দেবে বর্ধিত দামের বোঝা।

ইতিপূর্বে, অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকদের সামনে খুলে দিতে এবং তার মধ্য দিয়ে জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এরকম একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যাপক বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে অনুমোদনের সিলমোহর লাগাতে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ গোটা দেশে চালু করেছিল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিজেপি সরকার 'বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২০'-র মাধ্যমে নানা সংশোধনী প্রস্তাব এনে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের উর্বর মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে প্রচলিত আইনের ধারাগুলিকে আরও উদার করেছে। ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ত্রিধা বিভক্ত। উৎপাদন, পরিবহণ ও বণ্টন— এই তিন ভাগে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে ভাগ করে প্রতি ভাগে সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ মুনাফা লোটার ব্যবস্থা সেখানে পাকা করা হয়েছে— যা স্বভাবতই সাধারণ গ্রাহকদের পকেট কেটেই করা হচ্ছে। বর্তমান সংশোধনীতে পুরনো বিভাগগুলিকে আরও বাড়িয়ে তার সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশন সাব-লাইসেন্স এবং ফ্র্যানচাইজি ব্যবস্থা যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া ক্রম-ভরতুকি ব্যবস্থা তুলে দেওয়ারও প্রস্তাব সেখানে আছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকদের কর্তৃত্ব ইতিমধ্যেই অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া মালিকদের দেয় কর বা দায়ের বোঝা স্বাভাবিক ভাবেই কমবে। সাধারণ গ্রাহকদের উপর চাপবে আরও বর্ধিত দামের বোঝা।

উপরন্তু, এই সংশোধনীতে ইলেকট্রিসিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন অথরিটি (ইসিইএ) নামে একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা রাজ্যে বিদ্যুৎ বণ্টনকারী বিভিন্ন সংস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ, বণ্টন বা সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত নানা সংগঠনের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত নানা বিরোধের মীমাংসা করবে। এইভাবে সাংবিধানিক ধারা অনুসারে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের যে অধিকার বা ক্ষমতা এতদিন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে ন্যস্ত ছিল, তা চলে যাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সরকার-বহির্ভূত সংস্থার হাতে। যাদের সংসদের কাছে জবাবদিহির কোনও দায় থাকবে না। এতে সাংবিধানিক ধারা পরিষ্কার লঙ্ঘিত হবে।

বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর এই অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক সংশোধনীর (সংশোধনী বিল ২০২০) আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আজ গোটা দেশে জনস্বার্থকে পদদলিত করে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের যে বন্যা বইছে, তারই অংশ হিসাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণের এই সর্বাঙ্গিক প্রয়াস অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হন এবং তা বাতিল করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করুন।

# মহামারিও ধনকুবেরদের মুনাফার হাতিয়ার

বিশ্ব জুড়ে ইতিমধ্যেই দুই লক্ষাধিক মানুষের ঘাতক করোনা মহামারি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছে। সঠিকভাবে বরণ বলা উচিত এই অচল ব্যবস্থার কক্ষালটাকে যেন একেবারে হাটের মাঝে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যে সব বিশাল বিশাল শক্তিশ্রম দেশ একটা বোতাম টিপে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে যে কোনও দেশকে পরমাণু বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে তারা করোনা ভাইরাসের সামনে প্রায় নতজানু হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ২৭ মে পর্যন্ত বিশ্ব করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬ লক্ষ, মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাড়ে ৩ লক্ষের গণ্ডিকেও। এর মধ্যে একা আমেরিকাতেই আক্রান্ত ১৭ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি, মৃত্যু ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের মানুষকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, করোনা আড়াই লক্ষ নাগরিকের প্রাণ নেবে, তাঁর কিছু করার নেই। মানুষকে করোনা মহামারির গ্রাসের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দেশে দেশে পুঁজিবাদী শাসকেরা।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়েই মানুষের মধ্যে আকুতি—এই ব্যবস্থা আর চলতে পারে না। চাই সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের এই আকুতি যেন আজ ভূতের ভয়ের মতো পুঁজিবাদী দুনিয়ার কর্ণধারদের ঘুমের মধ্যেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সেই ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’-র কাল থেকেই এর হাত থেকে তাঁদের একদিনের জন্য রেহাই মেলেনি, আজ তাঁদের সেই আতঙ্ক আরও চেপে বসছে। আজ দেখা যায় লকডাউনে শুনশান ব্রাসেলস (নেদারল্যান্ডসের রাজধানী) শহরের রাস্তার ধারের বাড়ির ব্যালকনি থেকে এক তরুণীর কণ্ঠে ইতালির শ্রমিকদের গান যখন বাজার তুলে বলে ‘কমিউনিজমের জয় অবশ্যম্ভাবী, লাল পতাকার বিজয় রুখতে পারবে না কেউ’—তার সাথে গলা মেলায় গোটা পাড়া। আমেরিকা ইউরোপের দেশে দেশে উঠছে ক্লোগান, পুঁজিবাদ নয়, চাই সমাজতন্ত্র। তাই আজ সংবাদপত্র লেখে, ‘আর্থিক সমৃদ্ধি বন্টনে যে অসাম্য, তাহা দূর করিতে না পারিলে বিপদ গভীরতর হইবে। ইতিমধ্যেই ইতস্তত রব উঠিয়াছে সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান অনিবার্য’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.০৪.২০২০)। কিন্তু এই অনিবার্যতাকে মানলে কি আর পুঁজিবাদের সেবকদের চলে? তাই তাঁরা লেখেন, ‘যে আর্থিক সংকট উপস্থিত হইয়াছে ধনতন্ত্রের আত্মশুদ্ধির অদম্য স্পিরিটেই তাহা হইতে নিস্তারের রাস্তা খুঁজিতে হইবে’ (ওই)।

কিন্তু কী সেই অদম্য স্পিরিট, কেমনই বা তার আত্মশুদ্ধির রূপ? অদম্য স্পিরিটের একটি রূপ দেখা যাক—এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তিরূপে পরিগণিত মুকেশ আম্বানি সাহেব লকডাউনের মধ্যে শুধু এপ্রিল মাসেই ৯২ হাজার ২০২ কোটি টাকারও বেশি ঘরে তুলেছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৬.৬.২০২০)। বিশ্বে ধনকুবেররা অনেকেই এই সময় মহামারির দৌলতেই বিপুল মুনাফা করেছেন। মহামারিকে কাজে লাগিয়ে বিপুল এই মুনাফা নিয়ে খোদ আমেরিকার বৃহৎ প্রশ্ন উঠছে। দাবি উঠছে, মার্কিন কংগ্রেস (সে দেশের সংসদ) ‘প্যাডেমিক প্রিফিটিয়ারিং ওভার সাইট কমিটি’ গঠন করুক, যাতে মহামারিকে কাজে লাগিয়ে বিশাল মুনাফাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়? ১২ মার্চ, করোনা মহামারির কারণে মার্কিন শেয়ার বাজারে ধসের জন্য যে দিনটিকে ‘ব্ল্যাক থারসডে’ বলা হয়, সেই দিনে লক্ষ লক্ষ শেয়ার লগ্নিকারি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, সেই দিনে কয়েকজন ধনকুবের ফাটকার কারণে ঘরে তুলেছেন প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কোটি ডলার। লকডাউনের দেড়মাসে অনলাইনে অর্ডার নিয়ে পণ্য সরবরাহ করার কোম্পানি আমাজনের মালিক জেফ বেজোস লাভ করেছেন ২৫০০ কোটি ডলার, টেসলা কোম্পানির মালিক এলন মাস্ক মুনাফা করেছেন ১০০০ কোটি ডলার। অনলাইন পড়াশোনা, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি চালিয়ে ‘জুম’ কোম্পানির এরিক ইউয়ানের মুনাফা হয়েছে ৩৫০ কোটি ডলার প্রায়, মাইক্রোসফটের বিল গেটস, ফেসবুকের জুকেরবারগ কেউই কম যাননি (ফোর্বস ম্যাগাজিন, ১ মে ২০২০)। ভারতের ‘এড টেক’ কোম্পানি অনলাইন ক্লাস মিটিং ইত্যাদি বেচে লকডাউনে ৪০ কোটি ডলার তোলায় পরিকল্পনা নিয়ে নেমে ১০০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার রোজগার করে ফেলেছে। অনলাইনে জিনিসপত্র বেচার কোম্পানি ‘এভিনিউ

সুপারমার্চ’ কোম্পানির মালিক রাধাকৃষ্ণ দামানি কামিয়েছেন প্রায় ১০০০ কোটি ডলার। তার থেকে তিনি ১০০ কোটি ডলার বিজেপি নেতাদের তহবিল ‘পিএম কেয়ারসে’ দান করে শুদ্ধ হয়েছেন (ইন্ডিয়া নিউজ.কম ৮.০৪.২০২০)। যখন সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একমুঠো খাবার, দু-চারটাকা রোজগারের চিন্তায় আকুল, সেই সময় ধনকুবেররা ‘অদম্য স্পিরিট’ দেখিয়েছেন বটে! তাঁরা যাতে এমন ‘স্পিরিট’ দেখাতে পারেন তার জন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন থেকে শুরু করে ইতালি, রাশিয়া ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকেরা কেউই কোভিড-১৯ ভাইরাস জনিত মহামারি প্রায় হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে দেশে লকডাউন করেননি। যাতে ধনকুবেররা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। আবার যখন লকডাউনও করেছেন, তখন তাঁদের আসল প্রভু ধনকুবেরদের মুনাফার পথটা ঠিক করে দিয়েছেন। আর সব কিছু বন্ধ রেখেও লকডাউনের সময়েই দেশের মানুষের পয়সায় ভারত সরকার একের পর এক যুদ্ধাস্ত্র কিনে গেছে। কারণ আত্মনি, আদানি, টাটা ইত্যাদি ধনকুবেরদের অন্য দেশের বাজার দখলের তাকত বাড়তে হবে। একই সাথে দেশীয় পুঁজিপতিদের জন্য অস্ত্র তৈরির বরাত ধরার দালালির কাজে ঢিলে দেননি নরেন্দ্র মোদিরা। অথচ দেশের চিকিৎসকেরা, নার্সরা সুরক্ষা পোশাক (পিপিই)-র অভাবে সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ তৈরি করতে পারত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যাল। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বসিয়ে রেখে ওষুধের অর্ডার দিয়েছে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের কর্পোরেট কোম্পানিকে। যাতে তাদের মুনাফা হয়।

ট্রাম্প সাহেব আবার এর মধ্যেই একদিকে অস্ত্র বেচার কাজ করে গেছেন অন্যদিকে মোটর গাড়ি কোম্পানিদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে তাদের জন্য বিশ্ব টুর্নামেন্টে কৃত্রিম স্বাস্থ্য বা ভেন্টিলেটর মেশিন তৈরির অর্ডার জোগাড় করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। ‘বন্ধু’ নরেন্দ্র মোদিকে হুমকি দিয়ে তিনি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ ভারতের মানুষকে বঞ্চিত করে প্রায় লুণ্ঠ করেছেন, সেই ওষুধ নিয়ে ব্যবসা করছে ট্রাম্প সাহেবের কোম্পানি সহ আরও কয়েকটি মার্কিন বহুজাতিক। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমই লিখেছে, ফরাসি ওষুধ কোম্পানি সানফিতে ঘুরপথে ট্রাম্প সাহেব বিনিয়োগ করেছেন। সেই কোম্পানি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বেচছে। আয়ারল্যান্ডকে মার্কিন সরকার চাপ দিচ্ছে সেখানে মার্কিন ওষুধ কারখানা খুলতে দেওয়ার জন্য (ভঙ্ক.কম, ৭.০৪.২০২০)। ট্রাম্প সাহেব এখন মার্কিন ভেন্টিলেটর কিনতে ভারত সহ নানা দেশকে চাপ দিচ্ছেন। মহামারি যত বাড়বে তত ব্যবসা জমবে! স্পিরিটের তুলনা নেই!

‘আত্মশুদ্ধি’র একটা অসাধারণ উদাহরণ অবশ্য ভারতের বুর্জোয়া ব্যবস্থার কর্ণধাররা রেখেছেন। আজকের দিনের পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে সীমাহীন দুর্নীতি তা সকলেরই জানা। আগে অসাধু পুঁজি মালিকদের সাথে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের যোগসাজশকে বলা হত ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ বা স্যাণ্ডবক্স। আজকের দিনে আলাদা করে ‘ক্রোনি’ হওয়ার দরকার নেই। পুরো ব্যবস্থাটাই ‘ক্রোনি’। সরকার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি মেশিনারি এবং পুঁজিমালিক সকলেই এই চক্রে অঙ্গীভূত। এই লকডাউনের মধ্যেই চীন থেকে করোনা পরীক্ষার কিট আমদানি করার বরাত নিয়েছিল গুজরাটের এক সংস্থা। দেখা গেল তার প্রত্যেকটিই জাল। ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের করোনা পরীক্ষায় ত্রুটি থেকে গেছে। এর ফলে ‘স্পিরিট’ কিংবা ‘আত্মশুদ্ধি’ যে অভাব হয়নি তার প্রমাণ কয়েকদিনের মধ্যেই দিয়েছে আর একটি সংস্থা, তারা দেশজ ভেন্টিলেটর বলে যে মেশিন গুজরাট সরকারকে দিয়ে কিনিয়েছে, তার একটিও কোনও কাজ করে না। টাকা তারা পেয়ে গেছে অবশ্যই। কী করে? এই দুটি সংস্থাই প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ মালিকের। দ্বিতীয়জন সেই বিখ্যাত ১০ লাখ টাকা দামের সোনার সুতো দিয়ে সর্বস্বল্প নরেন্দ্র মোদি লেখা কোটিটি প্রধানমন্ত্রীর উপহার দিয়েছিলেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪.০৫.২০২০)। মানুষ জাল ভেন্টিলেটরে খাবি খেয়ে মরুক। ‘আত্মশুদ্ধি’র ঘাটতি যেন না পড়ে!

২১ এপ্রিল ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া সহ ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকার এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছে। কোভিড-১৯-এর থেকেও এই সব দেশের কোটি কোটি মানুষের সামনে প্রধান বিপদ অনাহার আর বেকারি। ফলে মানুষ আর লকডাউন মানতে নারাজ। বলিভিয়ার সরকার মিলিটারি দিয়ে লকডাউন চালানোর চেষ্টা করেছে, সেখানে সাংবাদিকরা দেখেছেন বাড়িতে বাড়িতে জনলায় লাগানো লাল ফিতের ক্রশ। এর অর্থ হল, বাড়িতে আটকে থাকা মানুষরা যে অনাহারে আছে, তা জানিয়ে সেনা জওয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মরিয়্যা চেষ্টা করছেন বাসিন্দারা। ব্রাজিলের মহামারি বিশেষজ্ঞ ইভান ফ্রান্সো গার্ডিয়ানের সাংবাদিকের কাছে বলেছেন, ‘স্টে হোম’ ‘স্টে সেফ’ এইসব কথাগুলি সাধারণের কানে শোনায় বুদ্ধিজীবীদের কিছু পোশাকি বুলির মতো। এসব তাদের কাছে অর্থহীন। বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণগুলিই তো সরকার তাদের দেয়নি। মে মাসের শেষে বিশ্ব দেখেছে ব্রাজিল সহ গোটা ল্যাটিন আমেরিকা করোনার হটস্পটে পরিণত হয়েছে। সারি সারি কবর খোঁড়া হয়েছে ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, মেক্সিকোর মতো দেশে (বিবিসি নিউজ, ২২.০৫.২০)।

আর আমেরিকা? এপ্রিল মাসেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত এবং মৃতের দেশ বলে পরিচিতি পেয়েছে আমেরিকা। কৃষক, আফ্রো-আমেরিকান, হিস্পানিক, এশিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকরাই সবচেয়ে বেশি করে করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন। এই জনগোষ্ঠীর মানুষই আমেরিকা জুড়ে কম বেতনের কায়িক শ্রম, ডাইভারি, রেস্টুরেন্টের রাঁধুনি, ওয়েটার, সাফাইকর্মী ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। আমেরিকা জুড়ে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এতটাই ব্যবসায় পরিণত যে জনস্বাস্থ্য বিষয়টাই লোপ পেয়ে গেছে। ফলে চিকিৎসার কোনও সুযোগই গরিব মানুষের নেই। তাঁরা দলে দলে মরেছেন, বিনা চিকিৎসায়। ধনতন্ত্রের ‘অদম্য স্পিরিট’ নিয়ে মার্কিন সরকার কী করেছে? মালিকরা লকডাউনের মধ্যে যথেষ্ট ছাঁটাই করেছে। সরকার নীরব দর্শক হয়েই থেকেছে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই সাড়ে চার কোটির বেশি মার্কিন শ্রমিক বেকার হয়েছেন (এএফপি ২৪.০৪.২০২০)। আর মার্কিন সরকারের ভূমিকা? তারা কাজ হারানো মানুষকে কিছুই দেয়নি। কিন্তু পুঁজির স্টিমুলাস হিসাবে বড় বড় একচেটিয়া মালিককে ৫ হাজার কোটি ডলারের প্যাকেজ দিয়েছে।

তাহলে ধনতন্ত্রের ‘অদম্য স্পিরিট’-এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে? লুণ্ঠ, সীমাহীন লুণ্ঠ। মানুষের শ্রমশক্তি, প্রকৃতির সম্পদ সব কিছুকে লুণ্ঠ করাই তার ‘স্পিরিট’। এর প্রয়োজনে কোনও নীতি-নৈতিকতার ধার সে ধারে না। এ কাজে মানুষের জীবন জীবিকা ধ্বংস, প্রকৃতির চরম ক্ষতি সাধনে, যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতেও এতটুকু পিছপা নয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষক গণতন্ত্রের ধ্বংসকারীরা।

একশো বছরেরও বেশি আগে মার্কস-এঙ্গেলসের যথার্থ উত্তরসূরী দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপকার লেনিন দেখিয়েছিলেন, ‘পুঁজিবাদের বিকাশ আজ এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যখন আগের মতোই পণ্যোৎপাদনের ‘রাজত্ব’ চললেও এবং সমগ্র অর্থনীতির বনিয়াদ বলে তা বিবেচিত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাতে ফাটল ধরেছে। এবং প্রধান মুনাফাটা যাচ্ছে ফিন্যান্স কারচুপির ‘প্রতিভাবানদের’ হাতে। এইসব কারচুপি ও ঠগবাজির ভিত্তিতে রয়েছে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ। কিন্তু এই সামাজিকীকরণ করতে মানবজাতি যে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে তা কাজে লাগছে... ফাটকাবাজদের’ (সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়)। আজ সারা দুনিয়ায় কী দেখা যাচ্ছে? শিল্প উৎপাদন, মানুষের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন যখন পুরোপুরি তলানিতে, সেই পরিস্থিতিতে ফাটকার কারণে এবং তথাকথিত ডিজিটাল ব্যবসা করে ফেসবুক, গুগল, জিও, আলিবাবার মতো কোম্পানিগুলো বিপুল মুনাফা লুটছে। আমাজন, জিও, ফেসবুক, জুম কোটি কোটি মানুষের তথ্য বেচেই কামাচ্ছে হাজার হাজার কোটি কোটি ডলারের মুনাফা।

এই লুণ্ঠেরা ব্যবস্থার স্বরূপ আজ অনেক চড়া মূল্যে চিনতে হচ্ছে মানুষকে। এ শিক্ষা ব্যর্থ হতে দিতে না চাইলে এই ব্যবস্থাটাকে উপড়ে ফেলার কাজে হাত লাগাতে হবে সকল নিপীড়িত মানুষকে।

# আর্থিক প্যাকেজ না ভাঁওতা!

১২ মে টেলিভিশনের পর্দায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর পরিচিত নাটকীয় ভঙ্গিতে গোটা দেশকে জানালেন, করোনা মহামারিতে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য তিনি কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার বিপুল আর্থিক প্যাকেজের বন্দোবস্ত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে নাকি তাঁর সরকার দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইছে। দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র দশ শতাংশ হবে এই প্যাকেজ। তাতে কী কী থাকছে, কোথায় কত টাকা বরাদ্দ হবে— সে সব অর্থমন্ত্রী সীতারমন-ই ঘোষণা করবেন। তারপর, টানা পাঁচ দিন অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, তাদের ত্রাণ প্যাকেজে কোথায় কত কী থাকছে। দেশের মানুষ আশা-ভরসায় বুক বাঁধছিল, জিডিপি-র দশ শতাংশ যদি বাজারের চাহিদা বাড়তে খরচ করা হয় তবে এই করোনা কবলিত মহা সঙ্কটের আবর্ত থেকে দেশকে টেনে তুলতে এই প্যাকেজকে এক কথায় বলা যায় একটি ইতিবাচক প্রয়াস। আবার বিজেপি সরকারের ধোঁকা দেওয়ার পারদর্শিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বহু সাধারণ মানুষ সন্দেহ করেছিলেন, ‘ডাল মে কুছ কালো হ্যায়’। হলও ঠিক তাই। দেখা গেল, প্রায় সবই জুমলা, সবই প্রায় ভাঁওতা।

এই অতিমারি সঙ্কটে সকলেই যখন বাঁচার কার্যকরী পথ খুঁজছে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ‘হাত পা ভেঙে দেওয়া ঠুটো’ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়া আর প্রায় সকলেই একমত— মানুষের হাতে এখন নগদ টাকা তুলে দেওয়াটাই একমাত্র পথ। প্রথম সারির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদরা সকলেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে সোজা-সাপটা নগদের ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

করোনা ভাইরাসের গায়ে যেমন অনেক কাঁটা বা স্পাইক, এই ‘ঐতিহাসিক’ কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজও কুৎসিত মিথ্যাচার, প্রতারণা, সংখ্যাতত্ত্বের চোখ ধাঁধানো কৌশল ইত্যাদি বহুমুখী স্পাইক সমৃদ্ধ। কী বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়? ফিসক্যাল (রাজস্ব সংক্রান্ত) প্যাকেজ? ত্রাণ প্রকল্প? সহজ-স্বল্প প্যাকেজ? না সংস্কারের কার্যক্রম? কোনটা?

কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার রূপকথার সংখ্যাটি কোনও মতেই দাঁড়াচ্ছে না। কোনও হিসাবেই অঙ্ক মেলানো যাচ্ছে না। লক্ষ করলে স্পষ্টতই দেখা যাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে নেহাতই দুই লক্ষ কোটির মতো টাকা খরচ হতে পারে। খাতায় কলমে দেখানো হয়েছে খরচ জিডিপি-র দশ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে সরকারের ঘর থেকে যে টাকাটা খরচ হবে তা জিডিপি-র এক শতাংশের মতো, কমেতেও পারে আরও। এ সব নিয়ে সরাসরি সাংবাদিকরা প্রশ্নও তুলেছিলেন, অর্থমন্ত্রী নীরব থাকা অথবা প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করেছেন।

## কী সেই প্যাকেজ?

প্যাকেজ ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে স্টিমুলাস বা প্রণোদনার কথা এখানে বলা হচ্ছে তার মানেটা ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া বড় মুশকিল। কিছু মাস আগে অর্থমন্ত্রী লক্ষ্মীকারীদের দেড় লক্ষ কোটি টাকা স্টিমুলাস বা প্রণোদনা দিয়েছিলেন, এ বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ লক্ষ্মীকারীদের দেড় লক্ষ কোটি টাকা কর মকুব করে তাদের সরাসরি খুশি করতে বা প্রণোদনা দিতে পেরেছিলেন। সেসব বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু বর্তমান প্যাকেজটির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করার বিষয়টি আসলে কী, সেটাই পরিষ্কার হচ্ছে না। ধরে নেওয়া যাক, সরকারের উদ্দেশ্য সারা দেশ জুড়ে নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড বাড়ানো এবং তার ফলে বাজারে চাহিদা ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি বাড়ানো হবে। তার প্রভাব জিডিপি-র উপর পড়বে এবং তার হারও বাড়বে।

‘গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট’ বা জিডিপি হল দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। অর্থাৎ মানুষ ভোগ বাবদ যা ব্যয় করেন, উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ীরা যত টাকা মোট লগ্নি করেন, সরকার মোট যা খরচ করে এবং আমদানি ক্ষেত্রে খরচের তুলনায় রপ্তানি ক্ষেত্রে থেকে পাওয়া টাকার মোট পরিমাণ যতটা বেশি হবে সব কটি পরিসংখ্যান যোগ করলে মোট জিডিপি-র পরিমাণ পাওয়া যাবে।

সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস অর্থাৎ সিএসও থেকে হিসেবটা চাইলেই জানা যায়। নিখুঁত হিসেব পাওয়া মুশকিল, সময় লাগে। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মরশুমি ওঠা-পড়া, বছরে কিছু সময়ে রাজনৈতিক ওঠা-পড়া ইত্যাদি রয়েছে। তবু একটা সুনির্দিষ্ট হিসেব করা যায়। এই জিডিপি-র ক্ষেত্রগুলি ধরে, অথবা কোনও একটি ক্ষেত্রে সরকারি ঘোষিত প্যাকেজ যতক্ষণ পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা দিতে না পারছে, সেই প্যাকেজে স্টিমুলাস বা প্রণোদনা বলে নির্দিষ্টভাবে কিছু পাওয়া যাবে না।

স্টিমুলাস বলতে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী উভয় মিলে যা বরাদ্দ প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, তা পরে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র দু লক্ষ কোটি টাকা, ঘোষিত প্যাকেজের দশ ভাগের এক ভাগ। কেন এমন হল? এটা কি ভুল করে? আসলে টাকার অঙ্ককে বাড়িয়ে দেখানোর ঝোঁকে সরকার বাহাদুর ফিসক্যাল অর্থাৎ রাজস্ব ক্ষেত্র আর মানিটরি অর্থাৎ আর্থিক ক্ষেত্রকে জুড়ে এক করে ফেলেছে। দুটো শব্দ আলাদা, অর্থও আলাদা, দুটো ক্ষেত্রেও আলাদা। অর্থশাস্ত্রে ফিসক্যাল ও মানিটরি ক্ষেত্রকে এক করা চলে না। এই দুটিকে দক্ষতার সঙ্গে খিচুড়ি পাকাতে অর্থনীতির স্কুলে পড়তে হয় না, মোদী-শাহর ‘জুমলা’-র পাঠশালাতে তালিম নিতে হয়।

রাজস্ব নীতি (ফিসক্যাল পলিসি) আর আর্থিক নীতি (মানিটরি পলিসি)-র পার্থক্যটা একটু ভেঙে বুঝে নেওয়া দরকার। ধরা যাক সরকার পরিকল্পনা করল পাঁচশো করে টাকা খরচ করা হবে। সত্যি তা যদি করা হয় দেখা যাবে এই দুটি ক্ষেত্রে টাকার চলমানতা পুরোপুরি ভিন্ন পথে কাজ করবে। রাজস্ব নীতিতে তা সরাসরি খরচ হবে সরকারি কোষাগার থেকে, যাবে মানুষের হাতে। আর্থিক নীতিতে তা ঋণের মাধ্যমে লগ্নির আকারে ঘুরপথে বাজারে পৌঁছাবে। এই নীতি দুটিকে, ক্ষেত্রদুটিকে এক করে ফেলে সেটা জাম আর জামরুলের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা হবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনেকগুলো সংস্কার বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রেপো রেট (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলিকে ধার দেয়) এবং রিভার্স রেপো রেট (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা রেখে ব্যাঙ্ক যে সুদ পায়) ক্রমাগত কমানো হয়েছে। হার দুটির হিসেব দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে চার ও সাড়ে তিন শতাংশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুদের হার উভয় ক্ষেত্রে কোনও দিন এতটা কমে যায়নি। খুব সহজ হিসেবেই দেখা যাচ্ছে সুদের হার কার্যত মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়েও কম হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সঞ্চয় অলাভজনক হয়ে পড়ছে। দেশের অর্থনীতির এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। সব কিছু মিলিয়ে মানুষ ভাবিত এবং দিশেহারা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উভয়ের উর্ধ্বতন মহল তথা পরিচালকমণ্ডলী মনে করে সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা হলেই অর্থনীতির চাকা ঘুরবে। অর্থমন্ত্রী তাই ঋণের সহজলভ্য হিসেবের ফিরিস্তিতে তার ত্রাণ প্যাকেজ ভরিয়ে দিয়েছেন— এই বিশ্বাসে যে কম সুদে বা সস্তায় ঋণ পেলে লোকজন তা দিয়ে ভোগ্যপণ্য কিনতে রাস্তায় নেমে পড়বেন। অর্থাৎ ভোগ ব্যয় বাড়বে, বাজার গরম হবে। বাজারের চাহিদা বাড়বে। তখন ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে না। বাজার চাহিদার অভিঘাতে ব্যবসায়ী-উদ্যোগপতির সস্তায় সরকারের ওই একই প্যাকেজ থেকে ঋণ নিয়ে শিল্পের ‘মরা গাঙে বান’ আনবে। কিন্তু বাস্তব যুক্তি-বুদ্ধি বলে, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা বিরানব্বই কোটি নিরন্ন, কাজ হারানো অসহায় সম্বলহীন মানুষ একটা খড়কুটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন। তাঁরা ঋণ পাবেনই বা কী করে? আর পেলেও তা নিয়ে কী করবেন? তাঁদের দরকার এখন খাদ্য, দরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার মতো কিছু অর্থ। তাছাড়া নানা ধরনের নথিপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে ঋণ করতে হয়, তাঁদের কাগজপত্র কোথায় যে ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাবেন? শোধ করবার ক্ষমতা নেই বলে ব্যাঙ্ক তাদের টাকা দেবেও না। আর খামোখা ধার করতে যাবেনই বা কেন তাঁরা? সব হারিয়ে নতুন করে বাঁচবার জন্য চাই নগদ টাকা, ঋণ নয় অথবা কাগজ, সার্টিফিকেটও নয়,

ঋণের প্যাকেজও নয়।

ফলে ঘোষিত আর্থিক নীতির মাধ্যমে ধরা যাক কেউ পাঁচশো টাকা ঋণ-প্রণোদনা পেলেন। সেই টাকা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অর্থনীতিতে, লগ্নি বা উৎপাদনে এর কোনও প্রভাব নাও পড়তে পারে। যতক্ষণ না কেউ ধার করে (ব্যাঙ্ক থেকে) নিজের ভোগ ব্যয় বা লগ্নির পরিমাণ বাড়ানো, ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্টিমুলাস প্যাকেজে অর্থনীতির চাকা ঘুরবে না। ভোগব্যয় বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি হল, অনিশ্চয়তা মানুষকে উণ্টোপথে ঠেলবে। মানুষ ভোগব্যয় কমিয়ে দুর্দিনের জন্য যতটুকু বাঁচতে পারে টাকা-পয়সা হাতে রেখে দেবে, আর লগ্নিকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে ধার না করে বাজারের অবস্থা বুঝে বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে লোকসান ঠেকাবার আশ্রয় চেষ্টা চালাবে। বাজারের পরিস্থিতিটাই এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে। অর্থমন্ত্রী কী এভাবে ভাবছেন, সুদের হার কম বা সস্তা বলে মানুষ ঋণ নিয়ে প্যাকেজ প্রণোদনে পাগল হয়ে গিয়ে গাড়ি-বাড়ি বা টিভি-ওয়াশিং মেশিন-এসি ইত্যাদি নতুন নতুন জিনিসপত্র কিনতে থাকবেন— এ সব এখন বিনিয়োগকারীরাও বিশ্বাস করেন না। বিনিয়োগকারীরা বাজারের হাল-হকিকত ভালোই বোঝেন। এর জন্য শিকাগো স্কুলে তাদের পাঠ নিতে হয়নি।

বেশি দিনের কথা নয়, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বিনিয়োগকারীদের কর ছাড় দিয়ে অর্থমন্ত্রী ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার স্টিমুলাস দিয়েছিলেন। লগ্নিকারীদের দাবি ছিল এক লক্ষ কোটি টাকা। তাদের দাবি ছাপিয়ে আরও পঁয়তাল্লিশ লক্ষ কোটি টাকা বেশিই দিল বিজেপি সরকার। মজার ব্যাপার হল বিনিয়োগকারীরা কর ছাড়ের টাকাটা পুরোপুরি চেষ্টেপুটে খেয়ে নিল, কিন্তু চেষ্টা করেও তাদের তেমনভাবে গোলানো গেল না লগ্নি বাড়ানোর বিষয়টি।

ফিসক্যাল বা রাজস্ব প্যাকেজ কাজ করে অনেকটা সোজাসুজি। যে খাতে টাকা ধার্য, সেই খাতেই লোকজন টাকাটা সরাসরি হাতে পাবে। ধরে নেওয়া যাক সরকার পাঁচশো টাকা খরচ করল পিএম কিষাণ বা মনরেগা প্রকল্পে। কৃষকদের হাতে টাকাটা সরাসরি গেল, বাড়তি আয় হিসেবে তাঁদের হাতে টাকাটা এল। এই টাকাটা অন্য কোনও বরাদ্দ থেকে তাঁদের হাতে কখনও আসেনি। এখন তাঁরা সেই পাঁচশো টাকার একটা অংশ তিনশো টাকা ভবিষ্যতে দুর্দিনের কথা ভেবে জমা রেখে বাদবাকি অংশ অর্থাৎ দুশো টাকা ভোগব্যয় বাবদ খরচ করলেন। এই খরচের টাকায় আবার যেসব ভোগ্যপণ্যের উৎপাদকদের আয় বাড়ল, তারাও সেই আয়ের অতিরিক্ত একটা অংশ খরচ করলেন ভোগব্যয়ে। ফিসক্যাল প্যাকেজ এভাবে কিছুটা হলেও অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে পারে— একেই অর্থশাস্ত্রে বলা হয় ‘মার্শ্টি প্লায়ার এফেক্ট’। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যে দুশো টাকা খরচ করা হয়েছিল, সেই টাকায় মোট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ে তার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। এ কথা তত্ত্বাকারে এসেছিল ‘জন কেইনস্ মার্শ্টি প্লায়ার’ নাম নিয়ে। এসব এখন অতীত, ইতিহাসের পাঠ্যবস্তু। উদারনীতি বা বিশ্বায়নের স্টিমরোলার ও সুপার প্রফিটের পথে চলা বেপরোয়া পুঁজিবাদ দুনিয়ার সাবেকি অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোটাই অনেকটা বদলে দিয়েছে।

## আগের বরাদ্দই নতুন করে দেখানো হল

গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফিসক্যাল বা রাজস্ব প্যাকেজে সরকার পাঁচশো টাকা খরচ করলে টাকাটা সরাসরি মানুষের হাতে আসে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারি এইসব প্যাকেজে ‘ইহার কা মাল উধার’ করে দিয়ে এই পাঁচশো টাকার প্রণোদনা একশো দিনের কাজের প্রকল্পের থেকে সরিয়ে পিএম কিষাণ খাতে দিলে অর্থনীতির হিসেবের খাতে কোনও ফারাক হবে না। প্রশ্নটা হল পাঁচশো টাকাটা বরাদ্দ ছিল আগের বাজেটের একশো দিনের প্রকল্পে। কিন্তু কী করে ওই টাকাটা নতুনভাবে অন্য প্রকল্পের নামে খরচ হয়ে গেল? এই আর্থিক কারচুপির মধ্য দিয়ে পুরনো প্রকল্পের প্যাকেজের টাকা

সাতের পাতায় দেখুন

## পাঠকের মতামত

### অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি বৈষম্য বাড়াবে

দেশে ঢালাও অনলাইন শিক্ষার প্রথম বলি হলেন কেরালার মল্লপুরম জেলার নবম শ্রেণীর ছাত্রী দেবিকা বালকৃষ্ণন। ১৪ বছরের ওই গরিব অন্ত্যজ পরিবারের ছাত্রীটির কোন স্মার্টফোন ছিল না। বাড়ির টেলিভিশন তিন মাস খারাপ। লকডাউন এর ফলে বাবার রোজগার কার্যত বন্ধ। তাই টিভি ও সারানো যায়নি। এ-দিকে অনলাইন ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে পুরোদমে। পড়াশোনায় আগ্রহী দেবিকা ক্লাস করতে পারছে না—এই হতাশা থেকেই গত ১ জুন আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এই মর্মান্তিক সংবাদটিকে কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখতেই পারেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ভারতের মতো বিশাল অর্থ গরিব দেশে ঢালাও অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিল?

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখা গেল, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্য নিয়ে সন্দিহান। শুধু তিনি নন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সংগঠন বিশেষত সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন 'এআইফোকটো' ও সর্বভারতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মঞ্চ 'অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি' এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন এই পদ্ধতিকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি আইআইটি ও আইসার এর মতো হাতে গোনা কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজে কিছুটা সাফল্য আনলেও, অধিকাংশ স্কুল-কলেজে বিশেষত সাধারণ সরকারি পোষিত স্কুল-কলেজে যেখানে অধিকাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের ছাত্ররা পড়াশোনা করে তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়াবে। ধনী-দরিদ্র এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষায় বৈষম্য প্রকট হবে।

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা ভাবনায় মধ্যযুগীয় হলেও প্রধানমন্ত্রী থেকে শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করার কথা বলছেন। এ বারের জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের শিক্ষা বাজেটে ডিজিটাল শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত কমছে— ২০১৯-২০তে ৬০৪ কোটি, ২০২০-২১-এ ৪৯৬ কোটি টাকা। ফলে অনলাইন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। আর ন্যূনতম পরিকাঠামো না গড়ে তুলে, নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের নামে সরকারি ও সরকারি পোষিত স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে, স্কুল শিক্ষার কী চরম অবনতি হয়েছে তা আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। শিক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে বেড়েছে বিভেদ ও বৈষম্য। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। অর্থ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী সম্প্রতি প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কথা বলছেন, সাথে সাথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পড়াশোনার কথা বলছেন। এই দুটোকে তারা কিভাবে মেলাবেন তাই বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা দেখতে পাচ্ছি অনলাইন শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সাধারণ গরিব মানুষের ঘরের ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। গরিব মানুষের ঘরে, শহরাঞ্চলেই হোক আর বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, ল্যাপটপ ও ভালো অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য কী বলছে দেখা যাক। সারাদেশে ২৪ শতাংশ মানুষের কাছে স্মার্টফোন আছে আর ১১ শতাংশ বাড়িতে ইন্টারনেট যোগাযোগ, তার মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ বাড়িতে, যেখানে ৫-২৪ বছরের ছাত্র ছাত্রী আছে, নেটওয়ার্ক সহ কম্পিউটার আছে। তার উপরে ইন্টারনেট যোগাযোগ খুবই খারাপ। অস্তোদয় মিশনের তথ্য অনুযায়ী ১৬ শতাংশ বাড়িতে ৮ ঘণ্টা, ৩৩ শতাংশ বাড়িতে ৯-১২ ঘণ্টা ও ৪৭ শতাংশ বাড়িতে ১২ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়া যায়, তাও লোভোস্টেজের সমস্যা সহ। দেশের ৬৬ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন যেখানে ১৫ শতাংশ বাড়িতে ইন্টারনেট আছে আর শহরে সে ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ (NSSO report ২০১৮)। আবার এই ইন্টারনেটের খরচ বহন

করতে হবে ওই ছাত্রদেরই, সরকার বাহাদুর করবেন না। দীর্ঘ লকডাউন এর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। টাকা যোগাবে কে? গৌরী সেন? যদিও এর ফলে বহুজাতিক ইন্টারনেট কোম্পানিগুলি কোটি কোটি টাকার মুনাফা করবে এবং বেসরকারি ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়বে। এ ছাড়া আমাদের দেশে রাজ্যে রাজ্যে ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য আছে। যেখানে দিল্লি, কেরালা, কর্ণাটক, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, প্রভৃতি রাজ্যে ৪০ শতাংশ, সেখানে ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, বিহার, এম পি, ছত্তিশগড়, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে ২০ শতাংশের কম ইন্টারনেট যোগাযোগ আছে (IMOAI report ২০১৯)। অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বক্ষেত্রে বিভেদ ও বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। তাই করোনার আবহে লকডাউনের বাজারে অনলাইন শিক্ষা নিয়ে খুব হইচই হলেও, এ ব্যাপারে সাফল্য কিন্তু খুবই কম। সরকারি তথ্য অনুযায়ী পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ।

এ ছাড়া আমরা জানি, শিক্ষাদান মানে তো কিছু তথ্যের আদান-প্রদান নয়। এটা জ্ঞানার্জন ও মানুষ গড়ার জীবন্ত প্রক্রিয়া যেটা একজন শিক্ষকের মাধ্যমে ছাত্ররা পেতে পারেন। ফলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে, '... শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ... গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মত চলাচল করিতে পারে। ('শিক্ষাবিধি', রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা- ১৫৪) তাই আমাদের মতোদেশে প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষা হতে পারে না। এটা বড়জোর প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

এ ছাড়া আরেকটি বিষয় যা ভাবা দরকার তা হল অনলাইন ও দুরায়ত শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার, প্রচলিত সরকারি ও সরকারি পোষিত নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করার আর্থিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করবে এবং সাধারণভাবে একদিকে দারিদ্র, অন্য দিকে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এর নামে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া সহ বিভিন্ন ভ্রান্ত নীতির ফলে সরকার পোষিত স্কুলগুলোতে যে ভাবে ড্রপ আউট বাড়ছে, সেই অজুহাতে বহু স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেবে। যা প্রায় সমস্ত রাজ্যেই শত শত স্কুল কলেজ ইতিপূর্বে বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

আশার কথা সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে প্রাক্তন ও বর্তমান উপাচার্য। সম্প্রতি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ২০১৪ সালে ভারতরত্নে ভূষিত প্রফেসর সিএনআর রাও এক বার্তায় বলেন, "I am not enthusiast about online teaching. We need human interface with students for good communication. That is how young minds can be inspired". (www.ndtv.com) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর সুরঞ্জন দাস উপাচার্যদের এক আলোচনা চক্রে বলেন, "E-learning can complement but not replace direct teaching-learning process." (ABP EDUCATION.COM)

এই করোনা-আবহ ও দেশজুড়ে লকডাউন এর মধ্যেও সরকারের ঢালাও অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার বিরুদ্ধে গত ২৩ মে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি অনলাইন প্রতিবাদ দিবস পালন করেছে এবং ৩০ মে বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতি ও শিক্ষাবিদ সহ হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত অনলাইন স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয়েছে। শিক্ষার মতো একটি বিষয় নিয়ে অহেতুক তাড়াহুড়ো না করে শিক্ষা বিষয়ক এই কমিটির বক্তব্য, সারা দেশের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা মাথায় রেখে বিরোধী দলগুলো পরিচালিত রাজ্য সরকারের বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আশা করব সরকার সেই কর্তব্য পালন করবে।

(সংবাদ সূত্র: Scroll.in/article/960939h)

দেবাশিস রায়

ধর্মতলা রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া

### দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না

সোশ্যাল মিডিয়ায় লাল সেলাম বা কমরেড বললে যেতে হবে জেলে। ঘরে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' থাকলেও রেহাই নেই। আপনাকে 'দেশদ্রোহী' তকমা লাগিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত আসামে বিটু সনোয়াল নামে এক কৃষক নেতাকে এই অভিযোগেই জেলে পুরেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ। তাঁর বিরুদ্ধে ইউ এ পি এ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আসামেই সি এ এ বিরোধী আন্দোলনে গত ১৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অখিল গগৈকে। পরে তাঁকে এনআইএ-এর হাতে তুলে দেয় পুলিশ। গত ২৯ মে এঁদের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট পেশ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেখানেই অপরাধীদের এমন 'মারাত্মক' অপরাধের কথা জানা যায়।

আসলে বিজেপির শাসনে সরকারের সমালোচনা মানেই দেশদ্রোহিতা। এর অসংখ্য উদাহরণ সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিনা বিচারে এমন 'দেশদ্রোহী'দের জেলে আটকে রাখা হচ্ছে দিনের পর দিন। এই লকডাউনের মধ্যে, সরকার সারা দেশের জনসাধারণকে ঘরে থাকতে বলেছে, বলেছে কোনও প্রতিবাদী জমায়েত চলবে না, কিন্তু নিজেদের জনবিরোধী কার্যকলাপ চাকতে যে কোনও একটা অজুহাত খাড়া করা চাই। তাই কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, যা কোনও নিষিদ্ধ বই নয়, খোলা বাজারে বিক্রি হয়, আমাদের দেশ সহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ঘরে এই বই পাওয়া যাবে, সেই বই ঘরে রাখার অপরাধে জেল হয়, মামলা হয় জামিন অযোগ্য ধারায়। এমনকি কমরেড বা লাল সেলাম বলা কোনও অপরাধ নয়। কোনও দিক থেকেই যখন কোনও অপরাধ প্রমাণ করার উপায় থাকে না, তখন দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

মনে রাখা দরকার, বিজেপি-আরএসএস নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ব্রিটিশের দালালি করেছে, তাই আজ মহান দেশপ্রেমিক সেজেছে। তারা দেশপ্রেমের ঠিকা নিয়েছে। তাদের অন্যান্য অত্যাচারের বিরোধিতা মানেই, সরকারের কোনও কালা কানুনের বিরোধিতা মানেই দেশের বিরোধিতা, এভাবেই তারা প্রচার করে। কিন্তু তারা জানে না, এভাবে প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা যায়, জেলে পাঠান যায়, কিন্তু প্রতিবাদকে দমন করা যায় না। তাই যত গ্রেপ্তার তত বিরোধিতা, যত অন্যান্য তত প্রতিবাদ।

রাজকুমার বসাক

কলকাতা

## সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি

একের পাতার পর

আমফানে বিশ্বস্ত বাংলার এক বিশাল অংশের জনজীবন। এই দুর্যোগ বিশ্বস্ত মানুষগুলির পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে দাঁড়ানোই যখন ছিল সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, দরকার ছিল পর্যাপ্ত ত্রাণ-প্যাকেজ, তখননরেন্দ্রে মোদী-অমিত শাহরা রাজ্যের মানুষকে শোনালেন ভোটের কথা, আর গড়িমসি করতে থাকলেন পর্যাপ্ত ত্রাণের বরাদ্দে। এটা কি বাংলার প্রতি তাঁদের দরদে প্রমাণ? তাঁরা যে সোনার বাংলা গড়তে চান, তার নমুনা?

দেশের বেশিরভাগ রাজ্যে এখন বিজেপির শাসন। সেই রাজ্যগুলি কি বিজেপির শাসনে সব সোনার হয়ে উঠেছে? মানুষের আর্থিক সংকটের সুরাহা হয়েছে? বেকাররা দলে দলে সেই সব ‘রামরাজ্যে’ চাকরি পাচ্ছে? বিনা পয়সায় সকলের চিকিৎসা মিলছে? ভয় শূন্য চিত্ত আর উচ্চ শির নিয়ে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিশ্চিন্তে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে? অতি বড় বিজেপি ভক্তরাও বলতে পারবেন না বিজেপি শাসনে এইসব সংকটের সুরাহা হয়েছে। বরং বিজেপি সরকার রাজ্যে রাজ্যে করোনা সংকটের আবহে মালিক শ্রেণিকে দিয়েছে যথেষ্ট শ্রমিক শোষণের, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ অধিকার। মালিকরা ইচ্ছামতো শ্রমিক-কর্মচারীদের মাইনে ছেঁটে ফেলছে। দেশের মানুষের ৯৫ ভাগের বেশিই তো গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের! সেই অংশকে আরও বেশি করে মালিকি শোষণ-বঞ্চনার মধ্যে ঠেলে দিয়ে কী করে জনজীবনে আর্থিক

সমৃদ্ধি আনবেন মোদী-অমিত শাহরা? বাংলার মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না, এটা নিছক একটা ভোটের চাল, গদি দখলের নোংরা ছল।

ভুললে চলবে না, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতা দখলের খোয়াব দেখতে পারছে সিপিএম, তৃণমূলের ভোট রাজনীতির জন্য। যে ১৮টি আসনে গত লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপি জিতেছে, সেখানে তাদের সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে সিপিএম নেতাদের ‘আগে রাম পরে বাম’ নীতি। ওই নির্বাচনে সিপিএম জোট যত শতাংশ ভোট হারায়, বিজেপির ভোট বাড়ে ঠিক তত শতাংশ। সিপিএম নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক এখনও অব্যাহত। কিন্তু সিপিএম নেতাদের এই ভ্রান্ত রাজনীতির খেসারত, যাঁরা আজ সত্যিই বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে চান তাঁদেরই দিতে হবে। অন্যদিকে তৃণমূলের সস্তা চমকের রাজনীতি, স্তরে স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, দলবাজি এ রাজ্যে বিজেপিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার বাড়তি সুযোগ দিয়েছে।

দেশের অন্যান্য অংশের মতো বাংলার মানুষও বহু বার প্রতারণার শিকার হয়েছে। কংগ্রেসের দীর্ঘ অপশাসনের পর সিপিএম, সিপিএমের অপশাসনের পর তৃণমূল সরকার— দলের নাম যাই হোক, মালিকের স্বার্থে একই রকম জনবিরোধী শাসন অব্যাহত থেকেছে। আজ আবার মালিকদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত আর একটি দল বিজেপি সোনার বাংলা গড়ার মায়াজাল ছড়াতে নেমেছে। কিন্তু মানুষকে গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে, মালিকদের স্বার্থবাহী একটি দলের সরকার বদলে তাদেরই স্বার্থবাহী আর একটি দলকে সরকারে বসিয়ে শোষণিত নিপীড়িত জনগণের জীবনের দুরবস্থার পরিবর্তন কি আদৌ সম্ভব হবে, নাকি বাস্তবে তা হবে, তপ্ত কড়াই থেকে লাফিয়ে জ্বলন্ত উনুনে পড়ার সামিল।

## প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

### মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের

দীর্ঘ লকডাউনে সরকারি অবহেলা ও অব্যবস্থার কারণে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আজ মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। কাজ, আশ্রয় ও জীবিকা হারানো শ্রমিকদের এমনকি কাজের প্রাপ্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত করছে নিয়োগকর্তারা। সভ্যতার কারিগর শ্রমিকদের প্রতি সরকারের এই অবহেলার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে ১ জুন একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংগঠন ‘মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন’।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন চার ঘন্টার নোটিশে লকডাউন ঘোষণা করেছিল তখন তারা ভাবার প্রয়োজনই অনুভব করেনি যে, বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে কীভাবে বাঁচবে, কীভাবেই বা নিজেদের বাড়িতে ফিরবে। কেন্দ্র বা রাজ্য— কোনও সরকারই এদের সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্বটুকুও অনুভব করেনি। এ অবস্থায় ২ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক শত শত কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরতে মরিয়া চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে অনেক মহিলা, শিশু ও বয়স্ক মানুষও ছিলেন। পথের মধ্যেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন, পথেই বহুজনের মৃত্যু হয়। ট্রাক ও ট্রেন দুর্ঘটনায় শতাধিক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। দেশজোড়া তীব্র নিন্দার চাপে পড়ে সরকার এখন কিছু স্পেশাল ট্রেন ও বাস চালানোর ব্যবস্থা করলেও, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। শ্রমিকরা চরম দুর্ভোগে পড়ছেন। ট্রেনের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে, তীব্র গরমে ক্লান্ত শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটছে।

সরকারের এই অমানবিক আচরণ ও শ্রমিকদের প্রতি অবহেলার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১ জুন দেশ জুড়ে দাবি দিবস পালন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো স্মারকলিপিতে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসাসহ দ্রুত ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত পরিমাণ রেশন ও মাসিক ন্যূনতম ৮০০০ টাকা ভাতা, মৃত শ্রমিকদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, আর একজন শ্রমিককেও যাতে এভাবে মরতে না হয় অবিলম্বে তার যথাযথ ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে।

## আর্থিক প্যাকেজ না ভাঁওতা!

পাঁচের পাতার পর

রিপ্যাকেজিং হয়ে নতুন প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে। এই ধরনের কারচুপি বিজেপি সরকারের সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজকে ভেঙে বিচার করে দেখা যাক। এর মধ্যে তিন লক্ষ কোটি টাকা ফিসক্যাল স্টিমুলাস, বাকিটা মানিটরি স্টিমুলাস। এই তিন লক্ষ কোটি টাকা ফিসক্যাল স্টিমুলাসের মধ্যে বেশ বড় অঙ্ক আগের বাজেটেই বরাদ্দ ছিল। আগের বাজেটের বরাদ্দকে নতুন খরচ বলে খরচ করা কারচুপি ছাড়া কিছু নয়। বাস্তবে সরকারের ঘোষিত প্যাকেজ জিডিপি-র দশ শতাংশ দূরের কথা এই কারচুপির মধ্য দিয়ে তা এক শতাংশ, কি তার থেকেও নিচে নেমে এসেছে। এই হল বিজেপি রাজনীতির মিথ্যাচার আর জুমলা সংস্কৃতির কুৎসিত মুখ।

ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ‘কুড়ি লক্ষ কোটি’ টাকার প্যাকেজ আসলে একটি নকল অর্থনৈতিক প্যাকেজ। মোদী সরকার পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে দেশের নিম্নবিত্ত, গরিব খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থের চেয়ে আন্তর্জাতিক রেটিং-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। রেটিং সংস্থাগুলি রাজকোষ ঘাটতি বা বাজেট ঘাটতি একেবারেই পছন্দ করে না। করোনা পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থনীতির হাল যে ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, সে সতর্কবার্তা আগেই জানিয়ে দিয়েছে মুডিজ, গোল্ডম্যান স্যাক্সের মতো আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থাগুলো। আগামী অর্থবর্ষে সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধির হার শূন্যে নেমে যাওয়ার পূর্বাভাসও মিলেছে। কিন্তু গত এক মাসে পরিস্থিতি যে আরও কত গুণ খারাপ হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল ‘সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি’

বা সংক্ষেপে সিএমআইই-এর রিপোর্ট।

সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-এর পরিসংখ্যান বলছে এই এক মাসে দেশে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যাটা বারো কোটি কুড়ি লক্ষ, সংখ্যাটা আরো বাড়বে বই কমবে না। এই সমীক্ষা চমকে ওঠার মতোই। গত এপ্রিলে তারা দেশে সাতশটি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়েছে। তাতে দেখা গেছে লকডাউনের জেরে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। সেখানে আশি শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। যাঁরা কাজ হারিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ দিনমজুর, ছোট ব্যবসার সাথে যুক্ত লোকজন, ফুটপাথের, ট্রেনের হকার, নির্মাণকর্মী, রিক্সা ও ভ্যানচালক। ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্সি ‘আইপিই গ্লোবাল’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায় ‘পরিস্থিতি এমনই, যত মানুষ ভাইরাসে মরবে, তার চেয়ে বেশি মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে।’ কারণ হিসেবে ‘ইউনাইটেড নেশন ইউনিভার্সিটি’-র একটি সমীক্ষা তিনি তুলে ধরেন। সেই সমীক্ষা বলছে, বিশ্ব ব্যাপক নির্ধারিত দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা (দৈনিক প্রায় দুশো তেতাল্লিশ টাকায় জীবনধারণ) অনুযায়ী ভারতের ৬০ শতাংশ (প্রায় ৮১ কোটি ২০ লক্ষ) মানুষ তখন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন। লকডাউনে কাজ হারিয়ে সেই সংখ্যাটি পৌঁছে যেতে পারে ৬৮ শতাংশে (প্রায় ৯২ কোটি মানুষ)। অর্থাৎ করোনা লড়াইয়ে সামিল ভারতে ভীষণভাবে বিপন্ন জীবন ও জীবিকা।

কোভিড ১৯-এর ফলে গোটা দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক অন্তহীন সমস্যায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও দিশেহারা। সেই সুযোগে মোদীর বিজেপি সরকার ‘৯০ সালের সংস্কারের পর দ্বিতীয়বার বিরাটাকার সংস্কার কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে

পড়েছে। একটা সরকার কত দূর হৃদয়হীন হলে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের কাছে সীমাহীন শোষণের রাস্তাকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে! একটার পর একটা দুর্ঘটনা, মালগাড়ি চাপা পড়ে, মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে দেশের মানুষ যখন ভীষণভাবে শোকাহত, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক সেই সময়টাকেই বেছে নিল প্রতিরক্ষা, কয়লা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে। তাদের বিপুল মুনাফালুটের সুযোগ করে দেওয়া হল। একইভাবে এই সরকার কৃষক ও সাধারণ ক্রেতাদের শোষণ করার জন্য কৃষিপণ্যের বাজারটাকেও কর্পোরেট ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে শ্রম আইন শিথিল করার তাড়া পড়ে গেছে। কিছু কিছু রাজ্যে কর্মদিবসের মেয়াদ বাড়িয়ে ৮ ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা করতে চাইছে। এভাবে বেয়াড়া শ্রমিকদের আচ্ছা করে জন্দ করতে পারলেই যেন এসে যাবে ‘আছে দিন’!

এক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। এক, দুনিয়া জুড়ে যখন মহামন্দা, মৃত্যুর মিছিল, তখন শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিলেও দেশে বিনিয়োগ বাড়ার আশা নেই বললেই চলে। কেবল শ্রমিকদের লাগামহীন শোষণ করলে বিনিয়োগ বাড়ে— এ ধরনের তত্ত্ব ভিত্তিহীন শুধু নয়, পাগলামিও। দ্বিতীয়, শ্রমিকরা পশু কিংবা যন্ত্র নয়। তাঁরা রক্ত মাংসে মানুষ, চেতনায় মানুষ। একের পর এক শ্রম আইন বাতিল করে, অধিকার কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের যথেষ্টাচার, লাগামহীন শোষণ, শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় শুধু অসন্তোষ আর ক্রোধ নয়, আজ অথবা কাল একদিন হৃদয়হীন নৃশংস এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনা বিপ্লবের মস্তে দীক্ষিত হবেই। বিপ্লবই একদিন সভ্যতার জঘন্য শত্রু পুঁজিবাদের অবসান ঘটাবে, আনবে শোষণমুক্ত নতুন সমাজ।

## শুকনো প্রতিশ্রুতি নয়, হয়রানি বন্ধ করুন

### পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন

করোনা অতিমারিতে চতুর্দিকে অসহায় মানুষ হাহাকার করছে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা অপ্রতুল, ব্যয়বহুল বেসরকারি ব্যবস্থাও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই সময়ে রাতদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে



‘ফ্রন্টলাইনার’ হিসাবে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে কাজ করে চলেছেন এ রাজ্যের হাজার হাজার আশাকর্মী। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম স্তম্ভ তাঁরা। অত্যন্ত কম বেতনে দিনের পর দিন বাড়-রোদ-বর্ষায় বিপদসঙ্কুল পথে তাঁরা পরিষেবা দিয়ে থাকেন। অথচ তাঁদের নেই ন্যূনতম নিরাপত্তা, নেই সরকারি স্বীকৃতি। বহু আশাকর্মী পাড়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীর খোঁজ করতে গিয়ে বা পরিষেবা দিতে গিয়ে নিগৃহীত হচ্ছেন। অনেককে পাড়ায় একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে। সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন তাদের নিরাপত্তা, উপযুক্ত সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানির প্রতিকার চেয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরে বারবার চিঠি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকেও তিন দফা চিঠি দিয়েছে ইউনিয়ন। শুকনো মৌখিক আশ্বাস ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই আশাকর্মীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আবার বহু আশাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে জানান পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

## ত্রাণ বিতরণ



১৪ জুন রায়দিঘির কুমড়োপাড়া অঞ্চলে বামনের ঘেরি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে বরণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি, কৃষ্ণচন্দ্রপুর কালচারাল ফোরাম, আটেশ্বরতলা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে ও কিছু সহায়ক মানুষের সাহায্যে এলাকার ২২৫টি দুঃস্থ পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।



দার্জিলিং জেলা এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে এনজিপি স্টেশনে চলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের রান্না করা খাবার বিতরণ

## গোয়ালপোখরে পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ



উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও-১ পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে দলের গোয়ালপোখর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১২ জুন ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, সমস্ত গরিব মানুষকে রেশন সামগ্রী দেওয়া, সব কর্মহীন মানুষকে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ দেওয়া, সবাইকে জব কার্ড, ন্যূনতম ২০০ দিন কাজ, বাড়ি বাড়ি শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, বাড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

## পরীক্ষা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা চাই

### সেভ এডুকেশন কমিটি

দীর্ঘ লকডাউনের জন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ফাইনাল সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। লকডাউনের মধ্যেই তাঁদের বেশিরভাগেরই শিক্ষাবর্ষের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অথচ হয় পরীক্ষা হয়নি না হয় অর্ধেক হয়েছে। তাঁদের অনেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। অথচ পরীক্ষার ফল না বেরোলে তাতে যোগ দিতে পারবেন না। যাঁরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় যাবেন, তাঁরাও কেনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতি কাটানোর জন্য অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব সহ চিঠি পাঠান। তাতে দাবি করা হয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কখন কীভাবে পরীক্ষা নেবে ও তার মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে এখনই ঘোষণা করুক। এই চিঠির কপি রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকেও তাঁরা পাঠিয়েছেন। ১৩ জুন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সচিব অধ্যাপক তরুণ নস্করকে ফোন করে পরীক্ষার বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইলে তিনি আগের দাবিগুলিই তুলে ধরেন। এই দাবি যে কতটা সঠিক তা পরিষ্কার হয়ে যায় ১৪ জুন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নীতি ঘোষণা করেছে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও তা অবিলম্বে করার দাবি পুনরায় জানিয়েছে সেভ এডুকেশন কমিটি।



নদীয়া জেলায় এআইএমএসএস-এর কৃষ্ণনগর ইউনিট ও কৃষ্ণনগর উইমেন্স কালচারাল ফোরাম-এর উদ্যোগে ৩০মে কিছু দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

## কলকাতার রাস্তায় সাইকেলে যাতায়াতের দাবিতে আন্দোলনের জয়



গত কয়েক বছর ধরে, জীবন জীবিকা রক্ষার স্বার্থে কলকাতার রাস্তায় নো সাইক্লিং জোন তুলে দিয়ে সর্বত্র সাইকেলে যাতায়াতের দাবিতে সাইকেল আরোহী ও সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলেছে যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও। একই দাবিতে 'কলকাতা সাইকেল আরোহী ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি'র আন্দোলনেও ডি ওয়াই ও পাশে ছিল।

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবন জীবিকা বাঁচাতে কলকাতার রাস্তায় চলাচলের জন্য সাইকেলেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যান হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায়, ৩ জুন পরিবহনমন্ত্রীকে ও ৫ জুন সাইকেল মিছিল সংগঠিত করে জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ (ট্রাফিক)কে ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি জানানো হয়, করোনা পরিস্থিতিতে কলকাতার নোসাইক্লিং জোন

তুলে দিয়ে সর্বত্র সাইকেলে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হোক। দাবি জানানো হয়, লকডাউনের পরে কলকাতার দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ বাস্তব যান সাইকেল চলতে দিতে হবে। জনমতের এই চাপে, ৭ জুন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, তাঁরা কলকাতার রাস্তায় সাইকেলে যাতায়াতের অনুমতি দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত জনমতকেই মান্যতা দেয়। এই জয় গণআন্দোলনের জয়, জনসাধারণের জয়। ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে এই জয়ের জন্য জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস। তিনি বলেন, নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে সাইকেলে যাতায়াতের জন্য 'লেন' তৈরির প্রয়োজন, এ বিষয়ে সরকার যদি চায় আমরা প্রস্তাব দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি।

## বাঁকুড়ায় জেলাশাসক দপ্তরে দাবিপত্র পেশ

হোম কোয়ারান্টিনে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা, কোয়ারান্টিন পর্ব শেষে কাজ এবং সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের লালারসের নমুনা পরীক্ষার দাবিতে বৃহস্পতিবার দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, পরিযায়ী শ্রমিকেরা বাড়ি ফেরার পরে অনটনে ভুগছেন। তাঁদের মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে।

## স্বরূপনগরে বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ



আমফানে তুলনায় বিপুল পরিমাণে বিক্ষোভ হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন কতক ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক হিসাবে চিহ্নিত না হওয়ার প্রতিবাদে ও স্বচ্ছতার সাথে দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে ৭ মে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিডিও ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করলে তাঁর চেম্বারের সামনে ধরনা শুরু হয়। আন্দোলনের চাপে পুলিশের মধ্যস্থতায় কর্তৃপক্ষ মত পরিবর্তন করলে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধি দল জয়েন্ট বিডিওকে স্মারকলিপি দেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর কয়েকটি দাবি আদায় হয়।

## বিরসা মুণ্ডা স্মরণদিবস উদযাপন

৯ জুন ঐতিহাসিক মুণ্ডা বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বিরসা মুণ্ডার ১২১তম স্মরণদিবস। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশিয়াড়ি ব্লকের কানপুর বিরসা মুণ্ডা স্মৃতি শিক্ষা নিকেতন, বিরসা মুণ্ডা স্মৃতিরক্ষা সমিতি, কথাবলা মনযোগ পঠন পাঠন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কানপুরে বিরসা মুণ্ডা ও বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন সমিতির কার্যকরী সদস্য পরেশ বেরা সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা। একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিরসা মুণ্ডার জীবনের নানা ঘটনাবলি ও জীবনদর্শনের কথা তুলে ধরেন বক্তারা।



## বাঁধ মেরামত, চাষের জমি-পুকুর সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন রায়দিঘিতে

৩ জুন রায়দিঘি ইরিগেশন এসডিও সাবডিভিশনে 'সুন্দরবন নদীবাঁধ জীবন ও জীবিকা রক্ষা কমিটি' ডেপুটেশন দেয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তম হালদারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এসডিও ইরিগেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। দাবিগুলোর অন্যতম হল— ১) বর্ষা আসার আগে নদীবাঁধগুলো দুর্যোগ মোকাবিলায় উপযুক্ত করে মেরামতি করতে হবে, ২) চাষীদের জমি অধিগ্রহণ করার পরেও কেন এখনও রিং বাঁধ নির্মাণ হল না তার জবাব দিতে হবে, ৩) আমফান বাড়ে নোনা জল ঢুকে নষ্ট হওয়া চাষযোগ্য জমি, পুকুর দ্রুত সংস্কার করতে হবে এবং পানীয় জলের সৃষ্টি বন্দোবস্ত করতে হবে, ৪) জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।



## ক্ষতিগ্রস্তদের দাবিতে তমলুকে বিক্ষোভ

লকডাউনের মধ্যেই আমফান বাড়ে বিক্ষোভ জনসাধারণ। যতটুকু ত্রাণ ও সরকারি সাহায্য আসছে তা নিয়েও চলছে প্রবল দলবাজি। এর প্রতিবাদে ১১ জুন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় মানুষ। অবিলম্বে বাড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের

জব কার্ড এবং ১০০ দিনের কাজ দেওয়া, খাল-রাস্তা সংস্কার, সমস্ত গরিব মানুষের জন্য পাকা বাড়ি প্রদান সহ পঞ্চায়েতের দলবাজি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ দিন পিপুলবেড়িয়া-২ অঞ্চলের অর্ধশতাধিক মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল অঞ্চল প্রধানের হাতে ১৩ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন তমলুক লোকাল কমিটির সদস্য শঙ্কু মান্না, সুকুমার মান্না, সঞ্জিত মাইতি প্রমুখ।



## আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের দাবি সরশুনায়

বিধবসী আমফান বাড়ে কলকাতার সরশুনা এলাকার পার্শ্ববর্তী ঠাকুরপুকুর-মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত আশুতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদীরাম পল্লী, বাগপোতা, দরিবাগপোতা, কলাগাছিয়া, বিবেকানন্দ পল্লী, সোনামুখী সর্দার পাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অসংখ্য মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সরশুনা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করেন। সেই তালিকা নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে গেলে কোনও সদস্যের পাওয়া যায়নি। এরপর সোজা বিডিও অফিসে গেলে বিডিও নামের তালিকা দিতে বলেন। ১২ জুন বিডিও-র কাছে নামের তালিকা দিলে তিনি আশ্বাস দেন যে ওই মানুষদের ত্রাণের বিষয়ে উদ্যোগী হবেন।

## আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় মার্কিন দপ্তরে বিক্ষোভ



মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বর্ণবৈষম্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে, কৃষক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আমেরিকার উত্তাল আন্দোলনের সমর্থনে ১২ জুন এস ইউ সি আই (সি) ও অন্য বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে কলকাতায় মার্কিন তথ্য দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল সহ, সিপিআইএম নেতা বিমান বসু ও অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলির বিক্ষোভে পুলিশি বাধা



৮ জুন এসপ্লানেডে লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে তিন শতাধিক বিক্ষোভকারীর এক শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু হতেই ২৭ জন বিক্ষোভকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মিছিলে অংশগ্রহণ করে এআইইউটিইউসি সহ ৯টি শ্রমিক সংগঠন। এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস সহ ছাত্র, যুব, নানা বামপন্থী মহিলা সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন। নরেন্দ্র মোদীর বন্ধু সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুশপুতুল দাহ করা হয়। রাজ্যের অন্য জেলাগুলির সদর শহরে এ দিন বিক্ষোভ দেখানো হয়।

## দাবি দিবস পালন এআইডিওয়াইও-র

পরিষায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা ও জীবিকার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত মাসিক আট হাজার টাকা ভাতা, মদ নিষিদ্ধ করা, ১০০ দিনের কাজ চালু করা সহ লকডাউন পরিস্থিতিতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ১০-১৭ ই জুন দাবি সপ্তাহ পালন করল যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। ১১ জুন মূলত দুইদফা দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশিয়াড়ী বিডিওকে দাবিপত্র দেওয়া হয় সংগঠনের কেশিয়াড়ী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে। দাবিগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বিডিও। দাবি সপ্তাহে সারা রাজ্যের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিডিও-দের কাছে দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে।



১১ জুন ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল, সরকারি সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষ্ণনগর মহকুমাসাশসককে স্মারকলিপি দেয় নদীয়া জেলা ডি ওয়াই ও। মহকুমাসাশসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে পদক্ষেপ গ্রহণ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা জানান।

## উত্তরাখণ্ডে ফি মকুবের দাবিতে ছাত্রবিক্ষোভ



করোনা পরিস্থিতিতে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজে ফি মকুবের দাবিতে ৭ জুন এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে রাজা জুড়ে বিক্ষোভ হয়। রাজ্যের ১১টি জেলায় সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রচার কর্মসূচি পালিত হয়। ছবিঃ গাড়োয়াল জেলার শ্রীনগর

## বিপর্যস্ত মানুষের পাশে ছাত্র-যুবরা



এআইডিওয়াইও-র স্থানীয় ইউনিটের পক্ষ থেকে ১২ হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

১০ জুন কলকাতা ব গোবিন্দ পু ব এলাকায় আমফান ঝড়ে বিপর্যস্ত ও লকডাউনের ফলে আর্থিক ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ৬০ টি পরিবারের হাতে এআইডিএসও টালিগঞ্জ-১ এবং



কলকাতার ঢাকুরিয়া আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে করোনা ও আমফান বিধ্বস্ত ৫০টি পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শুক্রা দে চৌধুরী ও কমরেড সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

## তমলুকে পরিষায়ী শ্রমিকদের পাশে দলের কর্মীরা

৫ জুন এস ইউ সি আই (সি)-র কয়েকজন প্রতিনিধি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরে দুটি এবং পার্শ্ববর্তী কিয়াখালি, আমগেছা, গোবিন্দপুর, বহিচাড় গ্রামের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলিতে থাকা শতাধিক পরিষায়ী শ্রমিকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের হাতে স্যানিটাইজার, মাস্ক ও খাদ্যদ্রব্য তুলে দেন। প্রতিনিধি দলটিতে ছিলেন দলের তমলুক লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়, চিন্ময়গোড়াই, শিক্ষক শম্ভু মান্না, সূর্য চক্রবর্তী প্রমুখ।